মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-১

বিরঞ্জন রায়

এবছর কার্ল মার্কসের পুঁজি প্রকাশের ১৫০ বছর। এই বছর রুশ বিপ্লবেরও শততম বার্ষিকী। শুধু বার্ষিকী বলে নয়, বলা যায়, একে উপলক্ষ করে মার্ক্সীয় দর্শন ও রুশ বিপ্লব পর্যালোচনায় আমরা বিশেষ মনোযোগ দেবো। সারা দুনিয়া জুড়েই এবছরে এই উপলক্ষে অনেক আলোচনা, সেমিনার, সম্মেলন, বিতর্ক ও প্রকাশনা হচ্ছে। তাঁদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য লেখা বা বক্তৃতাও আমরা বাংলাভাষায় উপস্থাপন করতে চাই। আমরা বছর জুড়েই এসম্পর্কিত লেখা প্রকাশ করবো। বর্তমান প্রবন্ধটি কয়েক পর্বে প্রকাশিত হবে। এতে মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব আলোচনা করতে গিয়ে তার প্রেক্ষাপট, দার্শনিক বিভিন্ন ধারা এবং মার্কসের ডক্টরাল থিসিস ধরে আলোচনার বিস্তার ঘটানো হয়েছে।

ভূমিকা

মার্ক্সের প্রকাশিতব্য প্রথম দার্শনিক রচনা, তার ডক্টরাল থিসিস 'দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য'। তবে তার দার্শনিক চিন্তার প্রথম লিখিত নিদর্শন 'এপিকুরীয় নোটবইসমূহ'। মার্ক্স ডক্টরাল থিসিস রচনার প্রস্তুতি হিসাবে গ্রীকদর্শন অধ্যয়ন করেন। তার অধ্যয়নের পদ্ধতি ছিল, অধীত বিষয়ের বিস্তারিত নোট নেওয়া এবং এ-সবের পাশে পাশে নিজের চিন্তাভাবনা টুকে রাখা। 'এপকুরীয় নোটবইসমূহ' মার্ক্সের গ্রীকদর্শন অধ্যয়নের অংশ। ডক্টরাল থিসিস কিংবা নোটবই, কোনটিই তার জীবদ্দশায় আলোর মুখ দেখেনি। কিন্তু তার দার্শনিক চিন্তা বিকাশের সূচনাটি অনুধাবনের জন্য উপর্যুক্ত দুটি রচনা অধ্যয়ন অপরিহার্য। বর্তমান প্রবন্ধে সে চেষ্টাই করা হয়েছে।

এপিকুরস পরমাণুবাদী গ্রীক দার্শনিক। তিনি দেবতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, কিন্তু যুক্তি দিতেন দেবতারা বিশ্ব বা মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। তার দার্শনিক অবস্থানের জন্য তিনি ধর্মবেত্তাদের রুষের শিকার হয়েছিলেন। পুরো মধ্যযুগে তিনি ছিলেন নিষিদ্ধ দার্শনিক। আধুনিক যুগের সূচনায় তার পুনরাবিষ্কার হয় এবং ইউরোপীয় আধুনিকতা নির্মাণে তার দর্শন একটি সহায়ক উপাদান হয়ে ওঠে।পনের থেকে আঠার শতক, ইউরোপীয় আধুনিকতার নির্মাতারা এপিকুরীয় দর্শনের এক একটি দিককে নিজেদের মতো করে কাজে লাগিয়েছেন। এপিকুরস-এর সার্বিক মূল্যায়ন শুরু হয় উনিশ শতকে। এ-ব্যাপারে মার্ক্সের গবেষণা অন্যতম পথিকৃৎ। বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকেও এপিকুরস-চর্চা থেমে নেই। এ-দলে যেমন রয়েছেন নিস্পৃহ গবেষকগণ, তেমনি রয়েছেন এপিকুরস অনুরাগী এবং অনুসারীগণ। এতসব গবেষণার ভিড়ে মার্ক্সের গবেষণাটি পুরানো হয়েও সমসাময়িক। মার্ক্সের দার্শনিক চিন্তা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় গ্রীক দর্শনের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন। এ সমালোচনা তীক্ষ্ণ গভীর নির্মম। যে দুজন গ্রীক দার্শনিক মার্ক্সের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন, এরা আরিস্ততেলেস এবং এপিকুরস। আররিস্ততেলেস-এর সঙ্গে হেলেনীয় দর্শনের তুলনাটি থেকে, এসব দর্শন সম্বন্ধে মার্ক্সের মনোভাবটি স্পষ্ট বুঝা যায়। 'এপিকুরীয় ও স্টোয়িক দর্শন এদের সময়ের ফসল। কারণ, সার্বজনীন সূর্য অস্ত গেলেই পতঙ্গেরা একান্ত ব্যক্তিগত বাতির চারপাশে ভিড় জমায়।' (এখানে সার্বজনীন সূর্য আরিস্ততেলেস, একান্ত ব্যক্তিগত বাতি এপিকুরীয় ও স্টোয়িক দর্শন।) আমরা বর্তমান প্রবন্ধে মার্ক্সের এপিকুরস-চর্চার মধ্যেই সীমিত থাকব। এর কেন্দ্রে রয়েছে মার্ক্সের ডক্টরাল থিসিস (আমি থিসিসটিকে সরাসরি উপস্থাপন করেছি।) এবং এপিকুরীয় নোটবইসমূহ, আর প্রাসঙ্গিকভাবে আসবে তার অন্যান্য রচনা। আমরা মার্ক্সের এপিকুরস-পর্যালোচনাকে উপস্থাপন করব মার্ক্সের সময়ের প্রেক্ষাপটে। কারণ, মার্ক্সের এপিকুরস-চর্চা একজন নিস্পৃহ গবেষকের তত্ত্বচর্চা নয়; এ এক বিপ্লবী মানসের বাস্তব সংগ্রামের অংশ। তাই এসব প্রাচীন দর্শনের পর্যালোচনার পরতে পরতেও মিশে আছে সমসাময়িক দার্শনিক ও রাজনৈতিক বিতর্ক। কিংবা সমসাময়িকতার পটভূমিতে দাঁড়িয়েই মার্কস গ্রীক দর্শনের পর্যালোচনা করেছেন গ্রীক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই শুধু গ্রীক অতীত নয়, সমসাময়িক জার্মানিও মার্ক্সের এপিকুরস পাঠের প্রেক্ষাপট। মাক্স এপিকুরসকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা উপস্থাপনের পাশাপাশি আমরা দেখে নেব তরুণ মার্ক্সের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠার প্রক্রিয়াটি।

উনিশ শতকের শুরুতে জার্মানী

হল্যান্ডে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন হয় ১৫৭৬ সনে, ব্রিটেনে ১৬৮৮ সনে, আমেরিকায় ১৭৭৫ সনে এবং ফ্রান্সে ১৭৮৯ সনে। জার্মানী তখনও বিজ্ঞান, শিল্পোৎপাদন, রাজনীতি, সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। ঘটা করে যাকে 'জার্মান জাতির পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' বলা হত, উনিশ শতকের গোড়ায় তা ছিল কয়েকশত সার্বভৌম রাষ্ট্রের সমষ্টি। এতে ছিল প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মতো বড় রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজ্য, ইলেকটোরেট, ডিউক ও ব্যারন'দের জমিদারি এবং স্বাধীন নগর-রাষ্ট্র। সম্রাট ও পরিষদের (diet) ক্ষমতা-সাপেক্ষে এদের সকলেরই যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল। সম্রাট ও পরিষদের ক্ষমতা অবশ্য কখনো কখনো ছিল নিতান্তই অলীক। ফলে সর্বত্র গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকত।

প্রত্যেক ছোটখাট রাজাই ছিল তাদের প্রজাদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক। রাজদরবারের ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী ও সরকারি আমলাদের হাতে। অর্থলোভী বুর্জোয়ারা নিজেদের উপর নির্যাতন ও অপমান এই বিশ্বাসেই মেনে নিয়েছিল যে, ঘোলাজলে মাছ ধরার সুবিধা অনেক। লাগাতার সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে তারা অঢেল অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে নিয়েছিল। তারা ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের মতো জনগণকে সাথে নিয়ে পুরনো শাসকদের হটিয়ে দেয়ার সাহস দেখায় নি। জার্মান মধ্যবিত্তশ্রেণিরও সেরকম কর্মশক্তি ছিল না। সেরকম সাহসের ভানও তারা করত না। একটা সর্বব্যাপী অস্বাচ্ছন্দ্য সারা দেশ ছেয়ে ছিল। শিক্ষা নেই, কোনো স্বাধীন সংবাদপত্র নেই, কোনো লোকহিতকর মনোবৃত্তি নেই, এমনকি অন্যদেশের সঙ্গে বিস্তৃত ব্যবসা বাণিজ্যও নেই। চতুর্দিকে শুধু ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা। একটা নীচ ছিঁচকে, হীন দোকানদারী মনোবৃত্তি সারা জনসমাজে পরিব্যাপ্ত ছিল।

তারপর বজ্রের মতো ফরাসি বিপ্লব এই গভীরঘুম ও বদ্ধজলার দুর্গন্ধের জগতটাকে আঘাত করল। নৈরাশ্য ও হতাশ্বাসের স্থানে দেখা দিল সর্বব্যাপী উৎসাহ ও উদ্দীপনা। উদারনৈতিক জার্মান বুর্জোয়ারা মদের আসরে বসে উদাত্ত কণ্ঠে 'মার্সাই' (ফরাসি জাতীয় সঙ্গীত) গাইলেন, ফরাসি জাতীয় পরিষদের কাছে অভিনন্দনবাণী পাঠালেন। জার্মান কবিরা ফরাসি জনগণের বন্দনা রচলেন। জার্মানিতে জ্যাকোবিন (ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী দল) সমর্থকদের

আত্মপ্রকাশ ঘটল। তারা জনগণকে বিপ্লবের জন্য অহ্বান জানাতে থাকল। কিন্তু পশ্চিমের বজ্রবাদলের এই মত্ততা ছিল ক্ষণস্থায়ী। জ্যাকোবিন সন্ত্রাসে জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণি আতংকিত হয়ে উঠল। যে সম্ভ্রান্ত কূপমন্ডুকরা ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগের স্বাধীনতা এবং সামন্ততন্ত্রের অভিজাতশ্রেণির (ডিউক ও কাউন্টদের) সঙ্গে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্ভবনা দেখেছিল, তারা তখন ফ্রান্সের সংবাদে কাপুরুষের মত কেঁপে উঠল, ক্ষুব্ধ হল। এই সেদিন যারা ছিল বিপ্লবের অত্যুৎসাহী বন্ধু, তারা হয়ে উঠল এর তিক্ত ও অন্ধ শত্রু।

১৮০৬ সনে নেপোলিয়ন জার্মানিকে পরাজিত করলেন। বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখতে গেলে, নেপোলিয়ন ছিলেন জার্মানির কাছে বিপ্লবের একজন প্রতিভূ। কেননা তিনিই বিপ্লবের নীতিগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুরনো সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি ঝেটিয়ে দূর করে তিনি তার নিজের আইনকানুন (যা ছিল তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল) চালু করেন। তিনি পচা-গলা জার্মান সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে দেন এবং জার্মানিতে ছোট ছোট রাষ্ট্রের সংখ্যা কমিয়ে বড় বড় রাষ্ট্র গঠন করেন। তবুও জার্মানরা নেপোলিয়নের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করল না। কারণ, সামরিক পরাজয়ে তাদের জাতীয় গর্ব আহত হয়েছিল। তাছাড়া জার্মান কূপমন্ডুকদের প্রাণপ্রিয় সামন্ততন্ত্রের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলোকে আক্রমণকারী তার বুটের লাথিতে দূর করে দিয়েছিল। যে অসাড় আলস্য থেকে জার্মানিকে রূঢ়ভাবে জাগানো হয়েছিল, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর (১৮১৪ সনে) জার্মানি সেই অবস্থায় ফিরে যাবার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুযোগ পেল। প্রতিক্রিয়ার শাসন সর্বত্র বিজয়ী হল।

রাইনল্যান্ড ফরাসি সীমান্তের লাগোয়া জার্মান অঞ্চল। এটি প্রুশিয়ার অন্তর্গত। ১৮০৩ সনেই নেপোলিয়ন তা দখল করে নিয়েছিলেন। এ অঞ্চলে বাসকারী ইহুদিরা এতে খুশিই হয়েছিল। কারণ তিনি পুরনো নিয়ম বাতিল করে নতুন নিয়ম চালু করেছিলেন। এই নতুন নিয়ম এখানকার ইহুদিদের সামনে ব্যবসা ও চাকরির দরজা খুলে দিয়েছিল। তাই দীর্ঘকাল অবদমিত ইহুদিদের নতুন একঝাঁক শক্তি বিপুল উদ্যমে, কোথাওবা অতি উদ্যমে, সাধারণ ইউরোপীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করা শুরু করল। এইসব স্বাধীনতার কিছু কিছু অংশ নেপোলিয়ন পরে নিজেই ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ১৮১৫ সনের পরে ফ্রান্স থেকে পুনরুদ্ধার করা জার্মান রাজ্যগুলোতে বাকীটুকুও রদ হয়ে গেল। যেসব ইহুদি তরুণ তাদের বাপ-দাদার যাপন করা পুরনো ধাঁচের জীবন ছেড়ে সাগ্রহে নতুন জীবন ও মানস ধারণ করা শুরু করেছিলেন, তারা পড়লেন বিপদে। ১৮১৬ সনেই প্রুশিয়াতে ইহুদিবিরোধী আইন চালু হল। নয়া প্রজন্মের ইহুদিদের সামনে খোলা রইল মাত্র দুটি পথ। হয় যাতনাপূর্ণ পথে নিজ সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবেশ করা, নয়তো ধর্ম বদলে বাকী জার্মানদের মতো খ্রিস্টানচার্চে যোগ দেওয়া। হার্শেল লেভি-র বাবা মাক্স লেভি এবং ভাই ছিলেন রাইনল্যান্ডের রাব্বী, একদম প্রথাগত গোঁড়া ইহুদি। প্রতিকূল খ্রিস্টীয় রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডল তাদের একমাত্র প্রতিরক্ষা ছিল সন্দেহ এবং অহংকারের দেয়াল। এই পরিবারে হার্শেল লেভি-ই প্রথম বেয়াড়া মানুষ। তিনি সেক্যুলার শিক্ষা গ্রহণ করে ফরাসি বুদ্ধিবাদীদের শিষ্যত্ব নেন। পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। এই ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় তার বড় ছেলে কার্ল মার্ক্সের বয়স ছয় বৎসর। হার্শেল তার বংশের পদবী লেভি পাল্টে বাবার নামের প্রথম অংশ 'মার্ক্স'-কে নিজের পদবী করে নেন। ইহুদি ধর্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিতদের একাংশ হয়ে পড়েছিল ধর্মান্ধ খ্রিস্টান, অপরাংশ সব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কার্ল মার্ক্সের পিতা আইনজীবি হার্শেল লেভি (মার্ক্স) এর কোনটাই হননি। তিনি রয়ে গেলেন ধর্ম ও রাজনীতিতে উদারপন্থী, ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান।

আমরা দেখেছি উনিশ শতকের গোড়াতে কূপমূ-কতা জার্মান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছিল। তবে জার্মানির সবাই যে কূপমন্ডুক ছিলেন এমন নয়। বিশেষত উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণি ছিল অনেকটাই কূপমন্ডুকতা মুক্ত। সেই জার্মানিরই মানুষ ছিলেন কান্ট, গ্যয়েটে, ফিকটে, হেগেল, শেলিঙ। কিন্তু বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে গ্যয়েটে ও হেগেলের মতো যেসব মহান ব্যক্তি তাদের যুগের সীমা ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠেছিলেন, তাদের পা দুটিও মাঝে মাঝে কূপমূ-কতার বদ্ধজলায় আটকে যেত। তবুও যারা পৃথিবীতে স্বর্গ বানাবার নতুন গান গাইতে শুরু করেছিল, তাদের ভরসা ছিল এঁদেরই উপর। হাইনরিখ হাইনে-র ভাষায়, 'যদি রাজার গলায় গিলোটিন পড়ার আগে ভলতেয়ারের হাসি ধ্বনিত হয়ে থাকে, যদি ফরাসি সামাজিক চিন্তাধারার ক্রান্তিকারী মঁতেস্কু, রুশো, দিদেরো-র ভাবধারা আঠারো শতকের শেষে ঐ দেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের পুরোগামী হয়ে থাকে; তবে একই ভাবে গ্যয়েটের 'মেফিস্তফিলিজ'-এর (ফাউস্ট মহাকাব্যের খলনায়ক) ক্রুর অবজ্ঞার হাসি এবং কান্ট ও হেগেলের গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক রচনা, সারা দুনিয়ার সামনে জার্মানির আসন্ন বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেছে।'

ফরাসি সীমান্তবর্তী জার্মান রাইনল্যান্ড ছিল ফরাসি ও জার্মান এই দুই সংস্কৃতিরই প্রভাব বলয়। এছাড়া রাইনল্যান্ডে ছিল জার্মানির সর্বোন্নত নানা ধরনের শিল্প ও কলকারখানা এবং সেই কারণে সবচেয়ে বেশি মাত্রায় ছিল প্রাচীন সমাজকে যারা কবর দেবে সেই শিল্প-শ্রমিক। তাই এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, রাইনল্যান্ডই ছিল মার্ক্স ও এঙ্গেলসের জন্মস্থান। ১৮৪০ এর দশকে অর্থাৎ যখন মার্ক্স ও এঙ্গেলস তাদের সামাজিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন জার্মানি তার অচল অনড় আলস্য থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে শুরু করেছে। দেশটা তখন ছিল বিপ্লবগর্ভ। চিরায়ত জার্মান-দর্শন এর জন্য এক ধরনের তাত্ত্বিক প্রস্তুতি জুগিয়েছিল।

ভিলহেল্ম হেগেল (১৭৭০-১৮৩১খ্রি.)

জার্মান ভাবাদর্শের বীজ বুনেছেন ইম্মানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪খ্রি.)। তারপর একঝাঁক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের কর্মপ্রয়াসে শীঘ্রই তা মানবিকী বিদ্যার সকল শাখায় ফলবন্ত হয়ে উঠে। কান্ট যদি ভাবাদর্শটির দর্শনাঙ্গের উৎস হন, তবে হেগেল তার মূলধারা। এই মূলধারায় সমসাময়িক যেসব চিন্তাবিদের চিন্তা অঙ্গীভূত হয়েছে এঁদের অগ্রগণ্য, ইয়োহান হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩ খ্রি.), ইয়োহান গ্যয়েটে (১৭৪৯-১৮৩২), ইয়োহান ফিক্টে (১৭৬২-১৮১৪), এবং ফ্রিডরিখ শেলিঙ (১৭৭৫-১৮৫৪)।

হেগেলের সমকালীন জার্মানির সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিবেশী ফ্রান্স বা ব্রিটেনের মতো জার্মানিতেও একটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠুক। সে-সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা ভাবিত ছিলেন ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ে। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র বা সমাজের বন্ধন-পীড়নকে তারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্তরায় হিসাবে বিবেচনা করতেন। কারণ, তাদের লক্ষ্য ছিল উঠতি বুর্জোয়াদের বিকাশকে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-রাজনৈতিক বাধামুক্ত করা। রুশো বলতেন, মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত। এর দ্বারা রুশো তার সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক শৃঙ্খলকেই বুঝিয়েছিলেন। বাস্তবে তো মানবশিশু জন্মায় অন্য মানুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে। সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমেই সে স্বাবলম্বী হয়। সমাজ ছাড়া তার অস্তিত্বই অসম্ভব। সমাজ যেমন মানুষকে

স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে, তেমনি তাকে অনেক বন্ধনে আবদ্ধও করে। কাজেই মানুষের লক্ষ্য হবে, সমাজ যেন ব্যক্তির বিকাশকে বাধাগ্রস্থ না করে; ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ পরস্পরের পরিপূরক হয়। তাই হেগেল বলতেন, ব্যক্তি পরাধীন হয়েই জন্মায়, তাকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। হেগেল-পূর্ব আধুনিক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরা, মানুষের স্বাধীনতা অর্জনে সমাজের ইতিবাচক ভূমিকাটি লক্ষ্যই করেন নি। তারা সমাজকে দেখেছেন পরাধীনতার কারণ হিসাবে। যেন, সমাজের বাইরে গিয়েই (যা কার্যত অসম্ভব) মানুষ স্বাধীন হতে পারে। বিপরীতে, হেগেল মানুষকে দেখেছেন সমাজের অঙ্গ হিসাবে। তাই তার মতে, কেবলমাত্র সুগঠিত রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। ইউরোপে তখনও নাগরিক আন্দোলন দানা বাঁধে নি। হেগেলের মনে হয়েছিল, দর্শনের মাধ্যমেই তিনি জার্মানিতে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পাররেন।

হেগেল লক্ষ্য করেছিলেন, কোনো জাতি হয় শাসক, আর কোনো জাতি শাসিত। তার মনে হয়েছিল, এ-দুয়ের পার্থক্যের কারণটি হয়তো কোনো জাতির জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এ-জন্য তিনি জার্মান জাতির জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা জাতীয় চিদাত্মা(Geist/Spirit) অনুসন্ধানে নিয়োজিত হন। [জার্মানিতে এ-চিন্তাধারাটির সূচনা করেছিলেন ইয়োহান হার্ডার। তিনিই ফকগাইস্ট (Volkgeist) বা গণচেতনা শব্দবন্ধটি উদ্ভাবন করেন। যুগচেতনা বা জাইটগাইস্ট (Zeitgeist) শব্দবন্ধটিও তারই উদ্ভাবন।] সাধারণ মানুষ তাদের সৃজিত শিল্প-সাহিত্যে, সংগঠিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং দর্শন-চিন্তায় কিভাবে জাতীয় চিদাত্মা গড়ে তোলে, হেগেল তাই খুঁজতে থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তার অনুসন্ধেয় বিষয়টি পাল্টে যায়। তার মনে প্রশ্ন জাগে, যে চিদাত্মাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেই 'চিদাত্মাটি' কী। তিনি সামাজিক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্র ছেড়ে দর্শনে পদার্পণ করেন।

দর্শন পাঠের আগেই হেগেলের পাঠ হয়েছিল ধর্মতত্ত্বে। লুথারীয় প্রটেস্টান্ট ধারার রহস্যবাদী ধর্মতাত্ত্বিক, ইয়াকব বোহমি-র (১৫৭৫-১৬২৪খ্রি.) ধর্মতত্ত্ব তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বোহমি-র মতে, সবকিছু পরমেশ্বরেরই প্রকাশ, তাই সবকিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সেই পরম, দ্বন্দ্বমুক্ত স্থবির নন বরং দ্বন্দ্বযুক্ত ও বিবর্তনশীল। পরমের অন্তঃস্থিত এই দ্বন্দ্বের কারণেই বিশ্বের সৃষ্টি। বিশ্বের সবকিছুই দ্বন্দ্বযুক্ত এবং দ্বন্দ্বই পরিবর্তনের কারণ। সৃষ্টির আগে, সৃষ্টি করার প্রেরণা ছাড়া, পরমের কোনো আত্মজ্ঞান ছিল না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞাতা (বিষয়ী) ও জ্ঞাতব্য (বিষয়) এই দুই ভাগ প্রয়োজন। তাই একমাত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই পরম নিজেকে জানতে পারেন। এজন্য সেই পরম, মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে ভালোমন্দ বাছাই করতে পারে এবং পরমকে জানতে পারে। মানুষ যেহেতু পরমেরই অংশ, তাই মানুষের জানার মাধ্যমে পরম, পরমকেই জানেন। মানব প্রজাতির এই জানার মধ্য দিয়ে পরম আত্মজ্ঞান অর্জন করেন এবং একটি নতুন সামঞ্জস্যে উপনীত হন।

হেগেল দর্শন চর্চায় এসেছিলেন তার এ গভীর ধর্মীয় বোধটিকে ধারণ করেই। পরমকে জানার ব্যাপারে মানুষের সক্ষমতায় তার আস্থা ছিল। তাই তিনি রহস্যবাদীদের মতো, 'পরম অবাঙমানসগোচর' (ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু উপলব্ধি করা যায়) বলে থেমে যান নি। তিনি পরমকে দার্শনিক ভাষায় প্রতিপাদিত (demonstrate) করতে চেয়েছেন। এ-কাজ করতে গিয়ে, তিনি শুধুমাত্র গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে তার সমসাময়িক ইউরোপের দার্শনিক ধারাগুলোকেই আত্মস্থ করেননি; প্রকৃতিবিজ্ঞান ও মানবিকীবিদ্যাকেও আত্মস্থ করতে চেয়েছেন। বিশ্বের সবকিছুকেই অন্তর্ভূক্তকারী তার দর্শনকে, তিনি একটি উচ্চাভিলাসী তন্ত্রে সংগঠিত করেছেন। হেগেলের দর্শনকে সহজ করে প্রকাশ করা সহজ নয়। তাই বর্তমান প্রবন্ধের জন্য তার দর্শনের যেটুকু প্রাসঙ্গিক, আমি তা সরল করে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

ইউরোপের অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) ধারার দার্শনিকগণ (বেকন, লক, হিউম প্রমুখ) মনে করতেন, একটি শিশুর মন সাদা পাতার মতন। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই তার জ্ঞান গঠিত হয়। হিউমের সমালোচনার আগ পর্যন্ত, এই ধারার দার্শনিকেরা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জ্ঞানের সত্যতা নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। হিউম প্রশ্ন তোলেন, আমরা একটার পর আরেকটা ঘটনা ঘটতে দেখলে বলি, প্রথমটা দ্বিতীয়টার কারণ। এ-তো অনুমান মাত্র। এমনটি যে ঘটবেই (অর্থাৎ এটি আবশ্যিক) এবং সব স্থানে ও কালে ঘটবে (অর্থাৎ এটি সার্বিক) এর নিশ্চয়তা কোথায়। যদি অভিজ্ঞতাই সব জ্ঞানের ভিত্তি হয়, তবে অনুমানের নিশ্চয়তা কোথায়? হিউমের সিদ্ধান্ত, অতএব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান পেতে পারি না। অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব বুদ্ধিবাদীরা (rationalist) (দেকার্ত, লাইবনিজ প্রমুখ) এ কথা বরাবরই বলতেন। তাদের মতে নিশ্চিত জ্ঞান (আবশ্যিক ও সার্বিক জ্ঞান) মানুষের আত্মায় সজ্ঞা আকারে বর্তমান রয়েছে। অনুধ্যানের মাধ্যমে আমরা তা লাভ করি এবং অবরোহী যুক্তি প্রয়োগে অন্যান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাই; যেমন গণিতের সূত্রসমূহ।

কান্ট জীবনের শুরু করেছেন বিজ্ঞান-গবেষণা দিয়ে। তিনি জানতেন বিজ্ঞানের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ভিত্তিক; আর বিজ্ঞান আবশ্যিক ও সার্বিক জ্ঞানেরই অনুসন্ধান করে। তিনি এ-ও বুঝতেন, বিজ্ঞান ছাড়া প্রগতি অসম্ভব। তাই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়লেন, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক জ্ঞানের ব্যাপারে হিউম যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, এর নিরসন হবে কিভাবে। এ সমস্যা সমাধানে, তিনি দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী ধারা দুটিকে সংশ্লেষণ করলেন। তিনি বললেন, অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের কাঁচামাল সরবরাহ করে। আমরা বিশেষ কোনোকিছুর জ্ঞান নিয়ে জন্মাই না বটে। কিন্তু জন্মমূহূর্তে আমাদের মনটি সাদা পাতার মতো নয়। আমরা মনের একটি কাঠামো নিয়ে জন্মাই। মনের এই কাঠামোটি অভিজ্ঞতায় পাওয়া কাঁচামালকে নির্দিষ্ট আকার দেয়। মনের এ-কাঠামোটি কোনো বিশেষ জ্ঞান অর্জনের পূর্ব থেকেই আবশ্যিক ও সার্বিক, অর্থাৎ পূর্বতসিদ্ধ। তাই মনের এ-কাঠামোর সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, তা আবশ্যিক ও সার্বিক। তিনি মনের এই কাঠামোটিকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে (category) ভাগ করেন। যেমন স্থান-কাল ক্যাটাগরি। আমরা ভৌত সব ঘটনাবলীকে স্থান ও কালে সংগঠিত করে সাজাই। কার্য ও কারণও এরকমই দুটি ক্যাটাগরি। এ দুটির মাধ্যমে আমরা দুটি ঘটনার সম্পর্ক বুঝতে পারি। কান্ট এরকম ১২টি ক্যাটাগরির বর্ণনা দিয়েছেন। আরিস্ততেলেস এরকম ১০টি ক্যাটাগরির বর্ণনা করেছিলেন। আরিস্ততেলেস বলেছিলেন এগুলো কোনো বিষয়ের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আরিস্ততেলেসের বিবেচনায় ক্যাটাগরি হল সত্তাতাত্ত্বিক (ontological)। বিপরীতে কান্ট যেহেতু ক্যাটাগরি মনের গড়ন বলে বিবেচনা করেন, তাই তার মতে ক্যাটাগরি জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistemological)।

দেখা যাচ্ছে, কান্টের মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং মনের ক্যাটাগরি অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে নিশ্চিত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় তো আমরা কোনো বস্তুর কতকগুলো

বৈশিষ্ট্যকে পাই শুধু (যেমন একটি আমের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ, আয়তন, ওজন ইত্যাদি)। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণ, বস্তুটিকে পাই না। তবে অভিজ্ঞতার অন্তরালে যে বস্তুটি রয়ে গেল, তার সম্বন্ধে তো অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক জ্ঞান সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার অন্তরালবর্তী বস্তুটির তিনি নাম দেন স্বগত বস্তু (thing in itself)। এভাবে কান্ট জগতকে অভিজ্ঞতার জগৎ বা প্রতিভাসের জগৎ (phenomenon) ও স্বগত বস্তুর জগৎ (noumenon) এ দু-ভাগে ভাগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, বিজ্ঞানের জ্ঞান নির্ভরযোগ্য বটে; কিন্তু বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা শুধু প্রতিভাসের জ্ঞানই পেতে পারি, স্বগত বস্তুর জ্ঞান নয়। কাজেই কান্ট অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা দে'য়ার পাশাপাশি অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের গন্ডিও নির্দিষ্ট করে দিলেন।

হেগেল বললেন, কান্ট সবকিছুকেই আত্মগত ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে দেখেছেন। যদিও কান্ট অভিজ্ঞতা পদটি দ্বারা সম্ভাব্য সকল অভিজ্ঞতা বুঝিয়েছেন। দেশস্থিত সকল সম্ভাব্য বিস্তার ও কালস্থিত সকল সম্ভাব্য মানসসত্তা যার অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু, আত্মগতভাবে যা আমাদের অভিজ্ঞতা, বিষয়গত ভাবে বিবেচনা করলে তাই হলো জগৎ। সুতরাং অভিজ্ঞতা ও জগতের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এটিই হেগেলের মূল সূত্র। হেগেলের দর্শন অনুসারে জ্ঞান (knowing) ও সত্তা (being) তথা বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। এভাবে হেগেলের মতে কান্টের বর্গসমূহ একই সঙ্গে জ্ঞানতাত্ত্বিকও বটে, সত্তাতাত্ত্বিকও বটে।

হেগেলের মতে, কান্টের স্বগত সত্তা বা নাউমেনন ও প্রতিভাস বা ফেনমেনন, বিষয়কে এভাবে ভাগ করাটাও কৃত্রিম। বাহ্যজগৎ অন্তঃস্থ সত্তার প্রকাশক। সুতরাং বহিঃস্থকে জানা মানেই অন্তঃস্থকেও জানা। স্বগত সত্তাই যদি প্রতিভাসের কারণ হয়ে থাকে, তবে প্রতিভাসকে (কার্যকে) জানলে স্বগত সত্তাকেও (কারণকে) জানা হয়। মানুষের জ্ঞান সঞ্চয়মূলক ও বিবর্তনমূলক। আজ যা অজ্ঞাত কাল তা জ্ঞাত হবে। চির অজ্ঞেয় কিছু থাকতে পারে না। কোনো বিষয়ের সব বৈশিষ্ট্যই জানা হয়ে গেলে যা বাকি থাকে তা হলো, বিষয়টি আমাদের চেতনার বাইরে অবস্থান করছে।

কান্ট তার বিখ্যাত Critique of Pure Reason গ্রন্থের Transcendental Dialectic অধ্যায়ে চারটি উভ-বিরোধের (antinomy) বিবরণ দিয়েছেন। এগুলো হলো ঃ (১) জগৎ দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ এবং জগৎ দেশ-কালাতীত অনন্ত। (২) জড়পি- অনন্ত সংখ্যক ভাগে বিভাজ্য এবং জড়পি- অনন্ত সংখ্যক ভাগে বিভাজ্য নয়। (৩) জাগতিক বিষয়াদি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং জাগতিক বিষয়াদি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। (৪) বিশ্বের অন্তঃস্থ আবশ্যিক ভিত্তি অথবা বহিঃস্থ আদি কারণ অবশ্যই রয়েছে এবং এমন কোনো সত্তা থাকতেই পারে না। কান্ট দেখিয়েছেন যে একই বিষয় সম্পর্কে যে দুটি বিরুদ্ধ অবধারণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাদের দুটোকেই সমান সত্য বলে যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে, দুটোকেই সমানভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে। অনন্ত সত্তাকে তথা জগতের স্বরূপকে জানতে গেলেই এই বিরোধের উ দ্ভব হয়। কান্টের মতে এই বিরুদ্ধতা বস্তুর স্বরূপে নেই, এই বিরুদ্ধতা নিতান্তই আত্মগত, অর্থাৎ এর কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্যই রয়েছে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই দুইয়ের কোনো পার্থক্য নেই। তিনি বলেন উভবিরোধ শুধু কান্ট উল্লেখিত চারটি মহাজাগতিক ধারণাতেই বর্তমান নয়; উভবিরোধ সর্বত্রই বিরাজমান। হেগেল কান্টের এই বিরোধিতা (contradiction) ধারণাকে কাজে লাগিয়েই চিরায়ত আকারগত যুক্তিবিদ্যাকে (formal logic) অতিক্রম করতে সক্ষম হন। হেগেলের মতে বোধশক্তিতে (understanding) কোনো ক্যাটাগরি ও তার বিপরীত ক্যাটাগরির মধ্যে বিরোধিতা বিদ্যমান। কিন্তু প্রজ্ঞান বা বুদ্ধিতে (reason) এই দুটি সমন্বয়যোগ্য, এই দুটি অভেদাত্মক। বোধশক্তি, আরিস্ততেলেস কথিত চিন্তার তিনটি মৌলিক নিয়মের উপর ভিত্তিমান। এগুলো হলো অভেদ নিয়ম (law of identity) [বস্তুটি 'আছে' মানে বস্তুটি আছেই।], বিরোধ নিয়ম (law of contradiction) [বস্তুটি আছে যদি সত্য হয়, তবে একই সময় এটি নেই তা সত্য হতে পারে না।] ও নির্মধ্যম নিয়ম (law of excluded middle) [একই সঙ্গে বস্তুটি আছেও আবার নেইও, তা-ও সত্য হতে পারে না।]। বুদ্ধি এসবকে অতিক্রম করে। বুদ্ধির ভিত্তি হলো বিপরীতের অভেদত্ব নীতি (the principle of the identity of opposites) [যেহেতু বস্তুটি পরিবর্তমান, তাই একই সময়ে বস্তুটি আছে এবং নেই।]। অভেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভেদ, তথা সভেদ অভেদত্বকেই হেগেল বৈপরীত্য (opposition) আখ্যা দিয়েছেন।

ধরুন একটি একটি বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। যদি বলি বীজটি আছে, তবে তা আংশিক সত্য। যদি বলি বীজটি নেই, তবেও তা আংশিক সত্য। যদি বলি বীজটি অঙ্কুরিত হচ্ছে, অর্থাৎ বীজটি একই সঙ্গে আছেও বটে, নেইও বটে, তবেই তা সত্যতর। আবার বীজটি অঙ্কুরিত হওয়ার পরও এটি স্থির থাকবে না, ক্রমেই বেড়ে চারাগাছে রূপান্তরিত হবে। তখনও বীজ থেকে জন্ম নেওয়া চারাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে, এটি আছে বা নেই না বলে, এটি আছেও আবার নেইও অর্থাৎ এটি বিকাশমান বলাই সত্যতর হবে। অতএব পরিবর্তমান কিছুর বর্ণনা প্রসঙ্গে আকারগত যুক্তির চেয়ে দ্বান্দ্বিক যুক্তি যথাযথ। মহাবিশ্বে পরিবর্তন কিংবা গতিই পরম, স্থিতি আপেক্ষিক। এই আপেক্ষিক স্থিতির বেলায় আকারগত যুক্তি প্রযোজ্য।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যায়, একটি ক্যাটাগরি প্রকাশিত হওয়া মাত্র এর থেকে এর বিপরীত ক্যাটারগরিটি বের হয়ে আসে এবং এটি স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। এই নতুন বিরোধ আবার নতুনতর ক্যাটাগরিতে উচ্চতর ঐক্যে বিলীন হয়ে যায়। ত্রয়ীর তিনটি পর্যায়কে সাধারণত বাদ (thesis), প্রতিবাদ (antithesis) ও সম্বাদ (synthesis) বলা হয়। অবশ্য হেগেল এ পদত্রয় ব্যবহার করতেন না। তিনি বলতেন ইতি (affirmation), নেতি (negation) ও নেতির নেতি (negation of negation)। হেগেলের মতে এই ধারণার কৃতিত্বও কান্টের। কিন্তু তিনি ধারণাটিকে বিকশিত করেন নি। কোনো ত্রয়ীতে সম্বাদটি বাদ ও প্রতিবাদের পার্থক্যের বিনাশ করে, আবার এই পার্থক্যকে সংরক্ষণও করে। নিছক বিনাশের অর্থ হলো অভেদত্ব, বৈপরীত্য নয়। নিছক সংরক্ষণের অর্থ হলো বৈপরীত্য, অভেদত্ব নয়। তৃতীয় ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্যাটারগরিদ্বয় পৃথক সত্তা হিসাবে বিরাজ করে না, এই অর্থে তাদের বিনাশ হয়। কিন্তু এখানে তারা সমন্বিতভাবে এক মূর্ত ঐক্যের উপাদান হিসাবে থাকে। এই অর্থে তারা সংরক্ষিত থাকে। সম্বাদের এই দ্বিমুখী ক্রিয়াকে হেগেল প্রকাশ করেছেন 'aufheben' শব্দটি দ্বারা। জার্মান এই শব্দটিকে ইংরেজীতে 'to sublate' হিসাবে অনুবাদ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে সত্তা সম্পর্কিত একটি ত্রয়ী বর্ণনা করা যাক। যেমন হেগেল বলেন, 'কিছু একটা আছে' (Being) এ-ইতিবাচক ধারণাটি, 'কিছু একটা নেই' (Nothing) এ-নেতিবাচক ধারণাটি নিয়ে আসে। এ-নেতিবাচক ধারণাটিও নেতিকৃত হয়ে যায় 'কিছু একটার উদ্ভব ঘটছে' (Becoming) এ-ইতিবাচক ধারণাটি দ্বারা। এই উদ্ভবের সময়, কিছু একটা আছেও আবার নেইও। তাই নতুন এ-ইতিবাচক ধারণাটি পূর্বের দুটি ধারণাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে

দেয় না, বরং নতুন একটি ঐক্যে ধারণ করে। আবার যখন সম্বাদটি নতুন ত্রয়ী অর্থাৎ পরবর্তী ত্রয়ীর বাদে পরিণত হয় তখন সেটিও আবার তার সম্বাদে অন্তর্গত হয়ে পড়ে, তার প্রতিবাদের মতোই সংরক্ষিত হয়। এই দ্বিতীয় ত্রয়ীর সম্বাদে বাদ ও প্রতিবাদ সংরক্ষিত হয়। দ্বিতীয় ত্রয়ীর বাদটি প্রথম ত্রয়ীর সম্বাদ বলেই প্রথম ত্রয়ীর বাদ ও প্রতিবাদ এতে সংরক্ষিত থাকে এবং এজন্যই দ্বিতীয় ত্রয়ীর সম্বাদে প্রথম ত্রয়ীর বাদ ও প্রতিবাদ সহ পূর্ববর্তী সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। আমাদের উদাহরণের 'অঙ্কুর'টি যদি প্রথম ত্রয়ীর সম্বাদ হয়, তবে দ্বিতীয় ত্রয়ী 'চারাগাছ'-এর জন্য এটিই বাদ। সেখানে ত্রয়ীর ধারাটি হবে, অঙ্কুরটি আছে–বাদ, অঙ্কুরটি নেই–প্রতিবাদ, অঙ্কুরটি চারাগাছ হচ্ছে–সম্বাদ। এই নতুন সম্বাদ 'চারাগাছ'-এ আগের দুটি ত্রয়ী অর্থাৎ বীজ থেকে অংকুর ও অংকুর থেকে চারাগাছ, সবই সংরক্ষিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় সম্বাদ 'চারাগাছ' হবে তৃতীয় ত্রয়ী 'গাছ'-এর বাদ। এভাবেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হয়, কিন্তু কোনোকিছুই একেবারে হারিয়ে যায় না। হেগেলের চূড়ান্ত ক্যাটাগরিটি এজন্যই সবচেয়ে মূর্ত। যদি পূর্ববর্তী সকল ক্যাটাগরি এর মধ্যে ধৃত না থাকতো তবে এটি হতো নিছক এক অমূর্তায়ন।

প্লাতন বলতেন, ধারণা বা ভাব, নিখুঁত ও শ্বাশ্বত। দুনিয়ার বিষয়াবলী ভাবের খুঁতযুক্ত প্রতিচ্ছবি মাত্র। হেগেলের মতে প্লাতন কথিত ধারণা, অমূর্ত সার্বিক (abstract universal)। বিপরীতে তার নিজের ভাব অমূর্ত সার্বিক হতে দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে মূর্ত হয়ে উঠে। কাজেই দুনিয়ার বিষয়াবলী ভাবের খুঁতযুক্ত প্রতিচ্ছবি নয়, ভাবেরই মূর্তরূপ। ভাব নিজের মধ্য হতে দুনিয়ার মধ্য দিয়ে নিজের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়ে, অমূর্ত সার্বিক থেকে মূর্ত সার্বিক (concrete universal) হয়ে উঠে। আরিস্ততেলেস-এর মতো হেগেলও বলতেন, কেবল বিশেষ বিষয়েরই অস্তিত্ব রয়েছে। বাস্তব সত্তা বা সার্বিক-এর এসব থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বিষয়টি একটু সরল করে বোধগম্য করার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন একটি প্লাজমার নেবুলা ক্রমে বিকশিত হয়ে গ্যালাক্সির রূপ নিল। নেবুলার সব পদার্থকে আমরা এক ধরনের সমসত্ত্ব অপৃথকীকৃত পদার্থ হিসাবে পাই। বিপরীতে একটি পূর্ণ বিকশিত গ্যালাক্সিতে রয়েছে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ সহ অনেক সুগঠিত পৃথকীকৃত অবয়ব। কোনো গ্রহে উদ্ভিদ ও প্রাণীও থাকতে পারে। এইসব পৃথকীকৃত সুগঠিত অবয়বগুলি নিয়েই গ্যালাক্সিটি গঠিত। এ-সবের বাইরে গ্যালাক্সিটির অস্তিত্ব নেই। হেগেলের পরিভাষায় বললে, নেবুলারূপ গ্যলাক্সিটি অমূর্ত সার্বিক আর বিকশিত গ্যালাক্সিটি মূর্ত সার্বিক।

আমরা উপরের উদাহরণে বীজ থেকে গাছ জন্ম নেয়ার যে উদাহরণ দিলাম, তা হেগেলের ত্রয়ীর সরলীকৃত রূপ। আমরা জানি এ প্রক্রিয়াটি একটি সময়ে সংঘটিত হয়। বীজ গাছের কারণ। কিন্তু বীজের গাছ হয়ে উঠার পিছনে বীজটি ছাড়াও আরো সহযোগী কারণ (যেমন আলো, বাতাস, পানি, মাটি) কার্যকর থাকে। অন্যদিকে হেগেলের ত্রয়ীর সম্পর্কটি কার্যকারণের (cause-effect) নয়, যৌক্তিক (reasonal)। এখানে প্রথম থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় ক্যাটাগরিটি যৌক্তিকভাবে নির্গত হয়; সময়ে সংঘটিত হয় না। হেগেলের মতে প্রথম ক্যাটাগরিটি দ্বিতীয় ক্যাটাগরিটির হেতু (reason); কারণ (cause) নয়। একই ভাবে দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির হেতু। তার মতে তৃতীয় ক্যাটাগরিটি প্রথম ক্যাটাগরিতে প্রচ্ছন্নরূপে (implicit) বিরাজ করে। যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় এটি তৃতীয়টিতে প্রকাশিত (explicit) হয় মাত্র। অন্যভাবে বললে, প্রথমটি তৃতীয়টির প্রচ্ছন্নরূপ আর তৃতীয়টি প্রথমটির প্রকাশ্যরূপ। (যেমন বীজ অঙ্কুরের প্রচ্ছন্ন রূপ, অঙ্কুর বীজের প্রকাশিত রূপ।) প্রথমটি প্রচ্ছন্ন থেকে প্রকাশ্য হবে বলেই দ্বিতীয়টি হয়ে তৃতীয়টির দিকে যাত্রা করে। তাই এখানে কোনো ত্রয়ীর গতির পরিণতি আগেই নির্দিষ্ট। এই অর্থে হেগেলীয় পদ্ধতিটি পরম-উদ্দেশ্যমূলক (teleological)। হেগেল বলেন দ্বিতীয় ক্যাটাগরিটি প্রথম ও তৃতীয়টির মাঝে মাধ্যম (mediator)। হেগেলের মতে বিশ্বের সবকিছুই মাধ্যমায়িত (mediated)। তাই তার তন্ত্রেও সব ক্যাটাগরিই ত্রয়ীতে বিন্যস্ত। আমরা দেখব, হেগেলের তন্ত্রের প্রথম ত্রয়ীটিতে, লজিক প্রকৃতির মাধ্যমায়িত হয়ে চিদাত্মায় উপনীত হয়।

সমগ্র হেগেলীয় তন্ত্রটি হলো নিম্নক্রমে বিন্যস্ত ত্রয়ীসমূহের (triad) ধারা। (উপরে আমরা সত্তা সম্পর্কিত একটি ত্রয়ীর বর্ণনা দিয়েছি। নিচে আর কয়েকটি ত্রয়ীর বর্ণনা দেব।) হেগেলীয় দর্শনের সর্বোচ্চ ক্যাটেগরি হল 'ভাব' বা সমগ্র বাস্তবতা (The IDEA)। এর অন্তর্গত প্রথম ত্রয়ীটি লজিক, প্রকৃতি ও চিদাত্মা। এদের প্রত্যেকটি আবার ত্রয়ীতে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকটিও আবার ত্রয়ীতে বিভক্ত। এই ত্রয়ীতে বিভাজিত হতে হতে বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর ক্যাটাগরিগুলি একটি শাখা প্রশাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষের রূপ নেয়। প্রথম ত্রয়ী অনুযায়ী হেগেলের তন্ত্রটি তিনটি অংশে বিভক্ত : (১) লজিক (Logic), (২) প্রকৃতিদর্শন (Philosophy of Nature) ও (৩) চিদাত্মাদর্শন (Philosophy of Spirit)। এই ত্রয়ীর প্রথমে রয়েছে লজিক বা স্বগত ধারণা অর্থাৎ ধারণা স্বয়ং যা (Idea as it is in itself), তা নিয়ে ব্যাপৃত। লজিক হল এই ত্রয়ীর বাদ। প্রকৃতি হলো পরগত ধারণা (Idea in its otherness), অর্থাৎ এটি স্বগত ধারণার বিপরীত। এখানে এটি প্রতিবাদ। চিদাত্মা হল ধারণা ও প্রকৃতির ঐক্য। এটি হল নিজের বিপরীত হতে নিজের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত ধারণা। এখানে এটি সম্বাদ। উপরে বর্ণিত তিনটি অংশের প্রতিটিই আবার ত্রয়ীতে (তিনভাগে) বিভক্ত।

লজিকের ত্রয়ীটি হল সত্তা (Being), সত্তাসার (Essence) ও প্রত্যয় (Notion)। আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতিটি বিষয়ই এক একটি সত্তা। উদাহরণ হিসাবে আমাদের আগের গাছটিকেই ধরা যাক। এটিও একটি সত্তা। এ-গাছ সম্বন্ধে যত জ্ঞান অর্জিত হয়, সবই এর সত্তাসার সম্বন্ধে জ্ঞান। যেমন গাছ কিভাবে শক্তি সংগ্রহ করে, কিভাবে বংশ বৃদ্ধি করে কিংবা গাছের উদ্ভব হল কিভাবে, ইত্যাদি। এ-সব নিয়ম শুধু কোনো বিশেষ গাছ নয়, সব গাছের জন্যই সাধারণ সত্য। আমরা গাছের যে-সব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, এমন অনেক প্রক্রিয়া নিয়ে একটি সমগ্র সত্তা হিসাবে গাছটি এর পরিবর্তনশীল অস্তিত্ব বহাল রাখে। কিন্তু গাছ সম্বন্ধে অর্জিত জ্ঞানে এই সত্তাটির কোনো দিক সম্বন্ধে আমাদের বোধগম্যতা বাড়ে। তত্ত্বগত জ্ঞান মূর্ত গাছ সত্তাটির কোনো দিকের অমূর্ত বর্ণনা। গাছের সত্তাটিকে নেতিকৃত করেই গাছের সত্তাসার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার গাছের সত্তাসার সম্বন্ধে অমূর্ত জ্ঞানকে নেতিকৃত করে গাছ সম্বন্ধে প্রত্যয় গঠিত হয়। 'গাছ প্রত্যয়'টিতে গাছ সম্বন্ধে আমাদের সব মূর্ত অভিজ্ঞতা ও সব অমূর্ত জ্ঞানই বিধৃত। কোনো প্রত্যয় সামাজিক অভিজ্ঞতার ফসল। কোনো এক সময়ে কোনো এক সমাজের গাছ সম্বন্ধে প্রত্যয়, সেই সমাজ তার পূর্বের সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে যা পেল, আর তাতে তারা নিজেরা যা যোগ বিয়োগ করল তারই ফল। এভাবে কোনো মূর্ত অভিজ্ঞতাকে নেতিকৃত করে আমরা এর বিপরীত অমূর্ত জ্ঞানে পৌছাই। আবার অমূর্ত জ্ঞানকে নেতিকৃত করে আমরা

কোনো বিষয়ের প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হই। প্রত্যয়ে সব মূর্ত অভিজ্ঞতা ও অমূর্ত জ্ঞান বিরোধপূর্ণ ঐক্যে বিধৃত থাকে। তাই বলা চলে, সত্তা, সত্তাসার ও প্রত্যয় হল যথাক্রমে ইন্দ্রিয়, বোধশক্তি ও বুদ্ধির ক্যাটেগরি। এই তিনটি ক্যাটেগরির সবিরোধ ঐক্যটি একটি গেস্টাল্ট (Gestalt)। এখানে তিনটি ক্যাটেগরির যেমন স্বাতন্ত্র্য ও পরস্পর বিরোধ রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঐক্য ও পরস্পর নির্ভরশীলতা। এমন জটিল সমন্বিত সমগ্র বুঝাতে জার্মান গেস্টাল্ট শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানে এর ব্যবহারের সূচনা করেন গ্যয়েটে। হেগেল গ্যয়েটের কাছ থেকেই ধারণাটি গ্রহণ করেন। জার্মানিতে বিশ শতকে 'গেস্টাল্ট সাইকোলজি' বলে মনোবিজ্ঞানের একটি ধারার সূচনা হয়।

সত্তার একটি ত্রয়ী সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সত্তার প্রথম ত্রয়ীটি হচ্ছে: (১) গুণ (Quality), (২) পরিমাণ (Quantity) ও (৩) পরিমাপ (Measure)। গুণ হল বাদ, পরিমাণ প্রতিবাদ, আর এদের সম্বাদ হল পরিমাপ। গুণ পরিমাণের উপর, আবার পরিমাণ গুণের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। গুণ ও পরিমাণের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা হতেই পরিমাপের ধারণাটি আসে। গুণ ও পরিমাণ পৃথকভাবে অমূর্ত, পরিমাপ হল এদের মূর্ত ঐক্য।

সত্তাসারের প্রথম ত্রয়ীটি হল : অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে সত্তাসার (Essence as Ground of Existence), প্রতিভাস (Appearance) ও প্রকৃতত্ব (Actuality)। সত্তাসার ও প্রতিভাস, আধেয় ও আকার (content and form), সম্ভাব্যতা (possibility) ও প্রকৃতত্ব, আবশ্যকীয় (necessary) ও অবান্তর (accidental) গুণ, কারণ ও কার্য, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া এ-সব ধারণা-যুগ্ম সত্তাসার সম্পর্কে অনুসন্ধানের অন্তর্গত। অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে সত্তাসার ও প্রতিভাস মিলে একটি ঐক্য গঠন করে। এই ঐক্যই প্রকৃতত্ব। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকের ঐক্য হিসাবে প্রকৃতত্ব স্বরূপত আবশ্যিকতার (necessity) অধিকারী, আর এই আবশ্যিকতাই হল বৌদ্ধিকতা (rationality)। আত্মগত প্রত্যয় (Subjective Notion), বিষয়গত প্রত্যয় (Objective Notion) ও ধারণা (The Idea) এ-তিনটি হল প্রত্যয়ের ত্রয়ী। আবার আত্মগত প্রত্যয়ের ত্রয়ী স্বগত প্রত্যয় (The Notion as Notion), অবধারণ (The Judgement) ও ন্যায়ানুমান (The Syllogism)। অবধারণ ও ন্যায়ানুমান প্রচলিত যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তবে হেগেল এসবের তাৎপর্য বদলে দিয়েছেন। প্রত্যয় (Notion) ও সম্প্রত্যয় (Concept) এক নয়। প্রত্যয় হল মূর্ত সার্বিক; সম্প্রত্যয় হল অমূর্ত সার্বিক। স্বগত প্রত্যয়ের ত্রয়ী সার্বিক (The Universal), বিশেষ (The Particular) ও একক/ব্যষ্টি (The Singular/Individual)। এসব সম্প্রত্যয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। হেগেলীয় তন্ত্রের সর্বত্র যে কোনো ত্রয়ীর প্রথম ক্যাটাগরিটি সার্বিক, দ্বিতীয়টি বিশেষ ও তৃতীয়টি একক। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ত্রয়ীটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিস্তৃত করা যাক।

ধরুন গরুর সত্তা ও সত্তাসার সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে আমরা গরু সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় গড়ে তুললাম। তারপর তা গরু রচনায় প্রকাশ করলাম। যার গরু সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই, গরু রচনাটি পড়ে তার যে প্রত্যয় হবে, এটিই সার্বিক বা সাধারণ প্রত্যয়। ধরা যাক, এই সার্বিক প্রত্যয়কে সম্বল করে তিনি গরু দর্শনে যাত্রা করেছেন। তিনি প্রথমেই দেখলেন একটি গাই। তার সার্বিক প্রত্যয় থেকে তিনি বুঝলেন, এটি গরু বটে। কিন্তু গাইটি সমন্ধে তার যে প্রত্যয়টি হবে তা বিশেষ প্রত্যয়। তারপর ক্রমান্বয়ে ষাঁড়, বাছুর দেখে; বাংলাদেশী গরু, ভারতীয় গরু, অস্ট্রেলীয় দেখে দেখে তার অনেক বিশেষ প্রত্যয় তৈরী হতে থাকবে। শেষে সব মিলিয়ে তার গরু সম্বন্ধে যে প্রত্যয়টি তৈরী হবে তা-ই গরু সম্বন্ধে একক প্রত্যয়। এই একক প্রত্যয়টিতে গরু সম্বন্ধে সার্বিক ও বিশেষ প্রত্যয়সমূহ সমন্বিত হয়েছে। (এই উদাহরণটিকে কোনো সামাজিক সংগঠন, যেমন পরিবার, রাষ্ট্র; কোনো বিজ্ঞানের বিষয় যেমন ব্যক্তিত্ব, আবহাওয়া, ইত্যাদিতেও বিস্তৃত করা যায়।)

ধরুন আমাদের গরুর দার্শনিকটি গরু সমন্ধে তার নবলব্ধ প্রত্যয়কে একটি রচনায় প্রকাশ করলেন। এবার অন্য কোনো গরু গবেষক এ-রচনা পাঠ করে গরু গবেষণায় নিয়োজিত হলে, উপরে উল্লিখিত রচনাটি হবে তার জন্য একটি সার্বিক প্রত্যয়। এটিকে ভিত্তি করে তিনি বিশেষ বিশেষ গরু সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় গঠন করে অবশেষে একটি নতুন একক প্রত্যয়ে পৌঁছবেন। এভাবে গবেষকের পর গবেষকের গবেষণার মাধ্যমে গরু সম্বন্ধীয় প্রত্যয়টি সমৃদ্ধ হয়ে চলবে। মানব জ্ঞান এ-ভাবেই অগ্রসর হয়। আমরা শূন্য থেকে শুরু করি না; মানব সমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করি এবং মানবিক অভিজ্ঞতার ভান্ডারে কিছু যুক্ত করি। [গো (গরু) + এষণা (খোঁজা) = গবেষণা; গবেষণার বুৎপত্তিগত অর্থ গরু খোঁজাই বটে !]

উপরের উদাহরণে আমরা প্রত্যয়ের ত্রয়ীটিকে সরলরৈখিকভাবে বর্ণনা করলাম। বাস্তবে বিষয়টি এমন সরলরৈখিক নয়। বরং ত্রয়ীটির প্রতিটি পর্যায়কে প্রত্যয়ের তিনটি মুহূর্ত হিসাবে বর্ণনা করাই অধিক যথাযথ। যখন আমরা কোনো বিশেষকে নিয়ে গবেষণা করি, তখন সার্বিকটি চিন্তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে থাকে এবং এককটি গঠিত হতে থাকে। আবার এককটি গঠিত হওয়া মাত্রই সার্বিকেও পরিবর্তন আসে এবং বিশেষ সম্বন্ধে গবেষণাটি নতুন স্তরে উন্নীত হয়। কাজেই প্রত্যয়ের তিনটি পর্যায়কে কোনো সরলরেখার তিনটি বিন্দু হিসাবে কল্পনা না করে কোনো ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দু হিসাবে কল্পনা করা অধিক বাস্তবানুগ। আমরা সার্বিক থেকে বিশেষ হয়ে যেমন এককে পৌঁছাতে পারি, তেমনি বিশেষ থেকে একক হয়ে সার্বিকে কিংবা একক থেকে সার্বিক হয়ে বিশেষে পৌঁছাতে পারি। এক্ষেত্রে প্রতিটি বিন্দুই প্রথম থেকে তৃতীয় বিন্দুতে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। তাই বলা চলে প্রত্যয় হল সার্বিক, বিশেষ ও এককের একটি গেস্টাল্ট।

হেগেল লজিকে তিন ধরনের গতির বর্ণনা করেন। সত্তার গতি ধারাক্রম (seriality), সত্তাসারের গতি বৈচিত্র্য (diversity) এবং প্রত্যয়ের গতি বিকাশ (development)। উদাহরণ হিসাবে আবার গাছের শরণাপন্ন হওয়া যাক। গাছ একটি সত্তা বটে। গাছ আসে গাছ যায়, এভাবে গাছের একটি ধারাক্রম তৈরী হয়। গাছ সম্বন্ধে গবেষণার নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। গবেষণার এক একটি ক্ষেত্র, গাছের সত্তাসারের এক একটি দিক নিয়ে গবেষণা করে। একটি ক্ষেত্র অন্যটিকে প্রতিস্থাপন করে না। এভাবে সত্তাসারে বৈচিত্র্য আসে। কিন্তু গাছের সত্তা ও সত্তাসার সম্বন্ধে জ্ঞান সমাকলিত হতে থাকে এবং ক্রমেই গাছ-প্রত্যয়টি বিকশিত হয়। কাজেই বলা চলে, গতি সম্বন্ধে 'থিসিস-এন্টিথিসিস-সিনথেসিস' হেগেলীয় ধারণা নয়। আর গতি বলতে শুধু তাই বুঝালে, তা বিকাশের গতিকে চিহ্নিত করে বটে; কিন্তু ধারাক্রম ও বৈচিত্র্যের গতি হারিয়ে যায়।

প্রকৃতিদর্শনের ত্রয়ীটি হচ্ছে, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও সংগঠনবিদ্যা। সংগঠনবিদ্যার ত্রয়ী, ভূতাত্ত্বিক সংগঠন, ভেষজ সংগঠন ও প্রাণীজ সংগঠন।

চিদাত্মার ত্রয়ীটি হল: আত্মগত চিদাত্মা (Subjective Spirit),

একে আমরা সবচেয়ে প্রসারিত অর্থে মনস্তত্ত্ব হিসাবেও চিহ্নিত করতে পারি। ক্রমোচ্চ ধারায় আত্মা, চেতনা ও মন এর আলোচ্য। বিষয়গত চিদাত্মা (Objective Spirit), ক্রমোচ্চ ধারায় বিমূর্ত অধিকার (right), ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও সামাজিক নৈতিকতা এর আলোচ্য। পরিবার, নাগরিক সমাজ, রাষ্ট্র এসব সামাজিক সংগঠনগুলো সামাজিক নৈতিকতার অন্তর্গত। পরম চিদাত্মা (Absolute Spirit), ক্রমোচ্চ ধারায় শিল্পকলা, ধর্ম ও দর্শন এর অন্তর্গত। বিষয়টিকে এ-ভাবেও দেখা যায়, কোনো সমাজের সদস্যদের মন, সামাজিক সংগঠন এবং সামাজিক ভাবাদর্শ– এই তিনে মিলে একটি সবিরোধ ঐক্য কিংবা সমন্বিত সমগ্র কিংবা গেস্টাল্ট। এ-তিনের বাইরে আলাদা সমগ্র বলে কিছু নেই। এ-তিনের প্রত্যেকটিরই স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু এ-অস্তিত্ব সমগ্রের ভিতরে, সমগ্রের অঙ্গ হিসাবে; সমগ্রের বাইরে নয়।

দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু (thing) ও বিষয় (object) এক নয়। বস্তু বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়েও অস্তিত্বমান হতে পারে। কিন্তু বিষয় শব্দটির দ্বারা অবশ্যই চিন্তার বিষয় বুঝায়। অর্থাৎ তার অস্তিত্ব স্বরূপতা বিষয়ীর উপর নির্ভরশীল। আর তার মানেই এটি হল চিন্তা। সবকিছুই হল বিষয়, এ কথার নিহিতার্থ হল, চিন্তা অর্থাৎ বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয় এমন কিছুই নেই। সাধারণ অবগতিতে বাহ্য বিষয়ই অবগতিকে নির্ধারণ করে। কিন্তু দার্শনিক অবগতি নিজেই নিজের বিষয়। সুতরাং এটি স্বনির্ধারিত (self-determined) এবং এজন্যই এটি অনন্ত। হেগেলীয় অর্থে অনন্ত বলতে বুঝায় স্বস্থিত ও সম্পূর্ণ (self contained and complete)। পরম অর্থে আত্মগততা, যা এর বিপরীত অর্থাৎ বিষয়গততাকে এর নিজের অধিভূক্ত করে। এর প্রতিপক্ষ হিসাবে এর বিপরীত আর কিছু থাকে না। আত্মগত বুদ্ধি (subjective reason) ও বিষয়গত বৈশ্বিক হেতু (objective world reason) অভেদাত্মক। আমাদের বুদ্ধিই পরম হেতু (absolute reason)। চিদাত্মা ও পরম-সত্তা সমার্থক পদ। আবার পরম-সত্তা ও ঈশ্বর অভিন্ন। পরম চিদাত্মা হল পরম-সত্তা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান। যে সমস্ত প্রকারে মানুষ পরম-সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে সেগুলোই হল পরম-চিদাত্মার বিকাশের পর্যায়। হেগেল প্রচলিত স্থূল অর্থে ঈশ্বরকে বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করেন নি। তার মতে পরম সত্তা বা পরম চিদাত্মা এক ব্যক্তিত্ব বটে; কিন্তু পরম চিদাত্মা বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ চিদাত্মা নয়। পরম চিদাত্মা এই অর্থে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে। বিশ্ব-ইতিহাস দৈব (chance) অথবা অন্ধ নিয়তি দ্বারা চালিত নয়; বরং চিরন্তন বুদ্ধি বা স্বয়ং ধারণার দ্বারা চালিত। তাই ইতিহাসের বিকাশ বৌদ্ধিক। ধারণা এভাবে বিশ্বের ইতিহাসের মধ্যে মূর্তরূপ লাভ করলে, তা হয় বিশ্ব-চিদাত্মা (World Spirit)। আসলে পরম-চিদাত্মাই হল বিশ্ব-চিদাত্মা।

মোটা দাগে দেখলে, হেগেল ইয়াকব বোহমি-র নিকট থেকে যে রহস্যবাদী বোধটি আত্মস্থ করেছিলেন, তার দর্শন এরই দার্শনিক প্রতিপাদন। কিন্তু এটি আংশিক সত্য মাত্র। সত্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো, এ কাজটি করতে গিয়ে হেগেল গ্রীক দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন-চিন্তাকে সংশ্লেষিত করে যে তন্ত্র নির্মাণ করেছেন, এতে মানুষের চিন্তা- প্রণালী একটি নতুন স্তরে উত্তরিত হয়েছে। মানব চিন্তার ইতিহাসে এটি হেগেলের মহোত্তম অবদান। পরস্পর সম্পর্কিত পরিবর্তমান-বিকাশমান এ-বিশ্বকে অনুধাবনের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-প্রণালী। হেগেলের *'Logic'* অধ্যয়ন, চিন্তা প্রণালীর গুণগত উত্তরণ ঘটানোর নির্ভরযোগ্য সিঁড়ি। (চলবে)

হাওরের মহাবিপর্যয়: সংবাদ সম্মেলন বক্তব্য

২১ পৃষ্ঠার পর

আমাদের বিশ্বাস পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে কোনো এলাকায় এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এতো বিশাল ক্ষয়ক্ষতির ঘটনার নজীর সারা পৃথিবীতেও আর একটাও নাই। কিন্তু এ নজীরবিহীন ঘটনা মোকাবেলায় সরকারী-বেসরকারী প্রস্তুতি নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি আমাদের সরকার, বিরোধীদল, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, মিডিয়া কোনো পক্ষই এখনো ঘটনার গভীরতা এবং ব্যাপকতাকে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্য বিপর্যয়কে মোকাবেলার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভাবছেও না।

উপরোল্লিখিত বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা নিম্নলিখিত করণীয়সমূহ জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি :

১) শুধুমাত্র বোরো চাষের উপর নির্ভরশীল ২৪ লক্ষ পরিবারকে খাদ্য সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

২) হাওরে সবার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩) সরকারী-বেসরকারী সকলপ্রকার ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত করতে হবে।

৪) ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ অথবা বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে হবে।

৫) হাওরে পানি-বাহিত রোগের প্রকোপ যাতে দেখা না দেয়, তার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬) শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং একইসাথে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সুস্থ রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭) হাওরের সকল জলমহালের লীজ বাতিল করে উন্মুক্ত জলাশয়ে সকলের মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে।

৮) হাওরের পরিবেশ দূষণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে হবে।

৯) বাঁধ নির্মাণে জড়িত দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, এবং

১০)স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ, প্রাকৃতিক মৎস্যক্ষেত্র সংরক্ষণসহ পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওরের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে।

লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন: ***হাসনাত কাইয়ুম***